

# যদু হাজরা ও শিখিধবজ

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

আপনারা একালে যদু হাজার নাম বোধ হয় অনেকেই শোনে নি।

আমাদের বাল্যকালে কিন্তু যদু হাজারকে কে না জানত? চব্বিশ-পরগণা থেকে মুরশিদাবাদ এবং ওদিকে বর্ধমান থেকে খুলনার মধ্যে যেখানেই বাজারে বা গঞ্জে বড়বারোয়ারীর আসরে যাত্রা হত সে সব স্থানে দশ বার ক্রেশ পর্যন্ত যদু হাজার নামলোকের মুখে মুখে বেড়াত। কাঠের পুতুল চোখ মেলে চাইত—যদু হাজার নামশুনলে। আপনারা কেউ কি যদু হাজারকে ‘নল দময়ন্তী’ পালাতে নলে-র পাট করতে দেখেননি? তা হলে জীবনের বহু ভালো জিনিসের মধ্যে একটা সেরা ভালো জিনিসহারিয়েছেন।

আমি দেখেছি।

সে একটা অদ্ভুত দিন আমার বাল্যজীবনে। তখন আমার বয়স হবে বারো কিতেরো। আমাদের গ্রামের একটি নববিবাহিতা বধূর বাপের বাড়িতে কি একটা কাজউপলক্ষে, নব বধূটিকে নৌকো করে তার বাড়িতে আমাকেই রেখে আসতে হবে ঠিক হল।

পৌষ মাস। খুব শীত পড়েছে। বধূটি গ্রাম-সম্পর্কে আমার গুরুজন, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ও বটে। দুজনে গল্পগুজবে সারাপথ কাটালুম। তাঁর বাপের বাড়ি পৌঁছে আমি কিন্তু পড়লুম একটু মুশকিলে। মস্ত বড় বাড়ি; উৎসব উপলক্ষে অনেক জায়গা থেকে আত্মীয়-কুটুম্বের দল এসেছে, তার মধ্যে দুটি শহর অঞ্চলের চালাক চতুর জ্যাঠা ছেলে আমার বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। আরও এত ছেলে থাকতে তারা আমাকেই অপ্রতিভ করে কেন যে এত আমোদ পেতে লাগল, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারি না।

একটি ছেলের বয়স বছর পনেরো হবে। রং ফর্সা, ছিপছিপে, সিক্কের পাঞ্জাবিগায়ে—নাম ছিল যতীন, নামটা এখনও মনে আছে— সে আমাকে বললে— কি পড়?

আমি বললাম—মাইনর সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি।

সে বললে—বল তো হাঁচি মাইনাস কাশি কত?

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক।

বাঙ্গালা স্কুলে পড়ি, ‘মাইনাস’ কথা মানে তখন জানিনে। তা ছাড়া একি অদ্ভুত প্রশ্ন! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে অমনি আবার জিজ্ঞাসা করল— “হবগবলিন” মানে কি?

আমি ইংরাজী পড়ি বটে কিন্তু সে সুশীল ও সুবোধ আবদুলের গল্প, দারোয়ান ওজেলের গল্প, বড় জোর গুটিপোকা ও রেশমের কথা—সে সবের মধ্যে ঐ অদ্ভুত কথাটা নেই; লজ্জায় লাল হয়ে বললুম—পারব না।

কিন্তু তাতেও আমার রেহাই নেই। ভগবান সেদিন লোক-সমাজে আমাকে নিতান্তহেয় প্রমাণিত করতেই বোধ হয় যতীনকে ওদের বাড়িতে হাজির করেছিলেন। সেদু’হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত করে আমার সামনে দেখিয়ে বললে—এতগুলো কলা যদি এক পয়সা হয়—তবে পাঁচটি কলার দাম কত?

আমি বিষণ্ণ মুখে ভাবছি, ওর দু’হাতের মধ্যে কতগুলো কলা ধরতে পারে—সে খিলখিল করে হেসে উঠে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে আমার মাইনর স্কুলে সেকেন্ডক্লাসে অর্জিত বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপন্ন করলে।

তারপর থেকে আমি তাকে ভয়ে-ভয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। বয়স তার আমারচেয়ে বেশিও বটে, শহর অঞ্চলে ইংরাজী স্কুলে পড়েও বটে, দরকার কি ওর সপ্তেমিশে? তা ছাড়া চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি আর কত অপমানই বা সহ্য করি!

কিন্তু সে আমায় যতই জ্বালাতন করুক, জীবনে সে আমার একটা বড় উপকারকরেছিল—সে জন্যে আমি তার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ। সে যদু হাজার অভিনয় আমাকে দেখিয়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে আমায় বললে—এই, কি নাম তোমার, রাজগঞ্জের বাজারেবারোয়ারী হবে, শুনতে যাবে?

রাজগঞ্জ ওখান থেকে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ। হেঁটেই যেতে হবে, কিন্তু যাত্রা শুনবার নামে আমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম যে, এই দীর্ঘ পথ এর সাহচর্যে অতিক্রম করবার যন্ত্রণার দিকটা একেবারেই মনে পড়ল না।

তথাপি সারা পথ যতীন ও তার দলের তারই বয়সী জন-কয়েক ছোকরা অশ্লীলকথাবার্তা ও গানে আমাকে নিতান্ত উত্তেজিত করে তুললে। আমি যে বাড়ির আবহাওয়ায় মানুষ,—আমার বাবা, মা, জ্যাঠামশায় সকলেই নিতান্ত বৈষ্ণব প্রকৃতির। প্রায় আমারই বয়সী ছেলের মুখে ওরকম টপ্পা ও খেউড় শুনে আমার অনভিজ্ঞ বালক-মনের নীতিবোধ ক্রমাগত ব্যথা পেতে লাগল।

ওরা কিন্তু আমায় রাজগঞ্জের বাজারে পৌঁছে একেবারে রেহাই দিলে। সেই অপরিচিত জন-সমুদ্রে আমায় একা ফেলে ওরা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—আমি কোন সন্ধানই করতে পারলুম না।

যাত্রা বোধ হয় রাত্রে, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, বারোয়ারীর খুব বড় আসর, অনেক ঝাড়-লণ্ঠন টাঙিয়েছে—বাঁশের জাফরীর গায়ে লাল-নীল কাগজের মালা ও ফুল, আসরের চারিধারে রেলিং দিয়ে ঘেরা, রেলিং-এর মধ্যে বোধ হয় ভদ্রলোকদের বসবার জায়গা—বাইরে বাজে লোকদের।

রাজগঞ্জের বাজারে আমি জীবনে আরও দু'একবার বাবার সঙ্গে এর আগে যে নাএসেছি এমন নয়, কিন্তু এখানে না আমি কাউকে চিনি, না আমাকে কেউ চেনে। রেলিং-এর ভিতরে জায়গা আমার মত ছোট ছেলেকে কেউ দিলে না—আমিও সাহসকরে তার মধ্যে ঢুকতে পারলুম না, বাইরে বাজে লোকদের ভিড়ের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে ইট পেতে বসতে গেলুম—তাতেও নিস্তার নেই—বারোয়ারীর মুরব্বির পক্ষের লোকেরা এসে আমাদের সে জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বিশিষ্ট লোকদের জন্যে বেঞ্চি আনিতে পাতিয়ে দেয়,—আবার যেখানে গিয়ে বসি, সেখানেও কিছুক্ষণ পরে সেই অবস্থা। অতি কষ্টে আসরের কোণের দিকে দাঁড়াবার জায়গা কোন মতে খুঁজে নিলুম। অন্যান্য বাজে লোকদের কি কষ্ট! তারা প্রায়ই চাষাভুষো লোক, পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর থেকে পর্যন্ত অনেকে মহা আগ্রহে যাত্রা শুনতে এসেছে—এই শীতে তারা কোথায়ও বসবার জায়গা পায় না, কেউ তাদের বসবার বন্দোবস্ত করে না—স্টেশন মাস্টারবাবু, মালবাবু, কেরানীবাবু ও পোস্ট মাস্টারবাবুদের যত্ন করে বসাতে সবাই মহা ব্যস্ত।

যাত্রা আরম্ভ হল। নল-দময়ন্তীর পালা। একটু পরেই যদু হাজরা “নল” সেজে আসরে ঢুকতেই—তখন হাততালির রেওয়াজ ছিল না—চারিদিকে হরিধ্বনি উঠল। অত বড় আসর মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ও নীরব হয়ে গেল।

আমি যদু হাজরার নাম কখনো এর আগে শুনিনি, এই প্রথম শুনলুম। মুগ্ধ হয়েচেয়ে রইলুম, শ্যামবর্ণ, সুপুরুষ—বয়স তখন বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, ত্রিশও হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু কি কথা বলবার ভঙ্গি, কি চোখমুখের ভাব, কি হাত-পানাড়ার ঢং। আমার এগারো বৎসরের জীবনে আর কখনো অমনটি দেখিনি। ভিড়ের কষ্ট ভুলে গেলুম, কিছু খেয়ে বেরুইনি, খিদেতে পেটের মধ্যে যেন বোলতায় ছলফোটাচ্ছে—সে কথা ভুললুম।

যাত্রা থেমে গেলে এত রাত্রে একা অজানা স্থানে শীতে কোথায় যাব—সে সব কথাও ভুলে গেলুম—পঞ্চ দেবতা পঞ্চ নলরূপে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় এসে বসেছেন, আসল “নল”—রূপী যদু হাজরা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে বলছেন—

এ কি হেরি চৌদিকে আমার—

মম সম রূপ নল চতুষ্টয়

মম সম সাজে সাজি বসিয়াছে

সভা মাঝে

বুঝিতে না পারি কিবা মায়াজাল

ইষ্টদেব,

পুরাও বাসনা মোর, মায়া জাল ফেল ছিন্ন করি।

এমন সময়ে বরমালা হস্তে দময়ন্তী সভায় প্রবেশ করতেই নল বলে উঠলেন—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে

আনন্দ-বারতা? এই আমি নল-রাজ

বসি স্তম্ভ পাশে।—

অপর চার জনও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে

আনন্দ-বারতা? এই আমি নল-রাজ

বসি স্তম্ভ পাশে।—

প্রকৃত নলের তখন বিমূঢ় দৃষ্টি!

তারপরে বনে বনে ভ্রাম্যমাণ রাজ্যহীন সহায়-সম্পদহীন উন্মত্ত নলের সে কি করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র! কতকাল তো হয়ে গেল, যদু হাজারার সে অপূর্ব অভিনয় আজও ভুলিনি। চোখের জল কতবার গোপনে মুছলুম সারারাত্রির মধ্যে, পাছে আশেপাশের লোক কান্না দেখতে পায়, কতবার হাঁচি আনবার ভঙ্গিতে কাপড় দিয়ে মুখ চেপে রাখলুম। যাত্রা শেষরাত্রে ভাঙল। কিন্তু পরদিনও আবার যাত্রা হবে শুনে আমি বাড়িগেলুম না। একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে আবারযাত্রা হল—শিখিধ্বজের পালা। যদু হাজার সাজলে শিখিধ্বজ। এটা নাকি তার বিখ্যাতভূমিকা, শিখিধ্বজের ভূমিকায় যদু হাজার আসর মাতিয়ে পাগল করে দিলে। সেই একরাত্রেরঅভিনয়ের জন্যে চার পাঁচখানা সোনা ও রুপোর মেডেল পেলে যদু হাজার। যাত্রা ভাঙল যখন তখন রাত বেশি নেই। আসরে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে সকালে একা নিজের গ্রামে ফিরে এলুম।

তারপর কয়েক বছর কেটেছে। তখন আমি আরও একটু বড় হয়েছি—স্কুলে ভর্তি হয়েছি। যদু হাজার কথা প্রায় এর-ওর মুখে শুনি। যেখানেই যাত্রা দলের কথা ওঠে, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যাত্রা দলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা যদু হাজার।

আমি কিন্তু বছরদিন যদু হাজারকে আর দেখলুম না।

এর অনেক কারণ ছিল।

আমি দূরে শহরের স্কুল-বোর্ডিং-এ গেলুম।

মন গেল লেখাপড়ার দিকে, ধরাবাঁধা রুটিনের মধ্যে জীবনের মুক্ত গতি বন্ধ হয়েপড়ল। অ্যালজেরার আঁক, জ্যামিতির একস্ট্রা, ইংরাজী ভাষার নেশা, ফুটবল, ডিবেটিং ক্লাব, খবরের কাগজ—জীবনের মধ্যে নানা পরিবর্তন এনে দিলে। ছেলেবেলার মতোযেখানে যাত্রার নাম শুনব সেখানেই দৌড়ে যাব—তা কে জানে চার ক্রোশ, কে জানেছ’ ক্রোশ—এমন মন ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। ইচ্ছে হলেও হয়তোস্কুলের ছুটি থাকে না, স্কুলের ছুটি থাকলেও বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছাড়তে চান নানানা উৎপাত।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলাম, থিয়েটার কাকে বলে জানতুম না। যে শহরে পড়তুম, সেখানে উকিল-মোজারদের একটা থিয়েটার ক্লাব ছিল, তাঁরা একবার থিয়েটারকরলেন, পালাটা ঠিক মনে নেই—বোধ হয় “প্রতাপাদিত্য”। ভাষা ও ঘটনার বিন্যাসে থিয়েটারের পালা আমাকে মুগ্ধ করল—ভাবলুম যাত্রা এর চেয়ে চের খারাপ জিনিস। প্লটের এমন বাঁধুনী তো যাত্রার পালাতে নেই? তারপর অনেকবার উকিলদের ক্লাবথিয়েটার দেখলুম—ছেলেবেলার মন ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে, বাজারে যাত্রা হল বারোয়ারীর সময়ে, কলকাতার দল, কিন্তু তাতে আগেকার মতো আনন্দ পেলুমনা।

তারপর কলকাতায় এলুম। তখন নতুন মতের অভিনয় সবে কলকাতায় শুরু হয়েছে। বড় বড় বহু বিখ্যাত নটদের অভিনয় দেখবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম ঘটল, তাদের নানা পালাতে নানা অভিনয় দেখলুম—বিলিভী ফিল্মে বিশ্ব-বিখ্যাত নটদের অভিনয় অনেকদিন ধরে দেখলুম—মানুষ ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়, উকিল-মোজারদের প্রধান অভিনেতা গুরুদাস ঘোষ—যাকে এতকাল মনে মনে কত বড় বলে ভেবে এসেছি—এখন তার কথা ভাবলে আমার হাসি পায়।

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকুরি করি। কলকাতার থিয়েটারের অভিনেতারাও তখন আমার কাছে পুরোনো ও একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে—থিয়েটার দেখাই দিয়েছি ছেড়ে। ফিল্ম সম্বন্ধেও তাই। খুব নামজাদা অভিনেতা নাথাকলে সে ছবি দেখতে যাইনে—যাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি একদিন—এখন তাঁদের অনেকের সম্বন্ধেই মত বদলেছি।

এই যখন অবস্থা, তখন কি একটা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে শুনি দেশে বারোয়ারী। শুনলুম, কলকাতা থেকে বড় যাত্রার দল আসছে— দেড়শো টাকা এক রাত্রির জন্যে নিয়েছে, এমন দল নাকি এদেশে আর কখনও আসেনি। ভালো বিলিভী ফিল্মই দেখিনি, থিয়েটার দেখাই ছেড়ে দিয়েছি ভালো লাগে না বলে—এ অবস্থায় রাত জেগে যাত্রা দেখবার যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মনে জাগবে না—একথা বলাই বাহুল্য। যাত্রা আবার কি দেখব! নিতান্ত বাজে জিনিস—কে কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে লোকের ভিড়ে বসে যাত্রা দেখতে যাবে?

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা ছাড়লেন না। বারোয়ারীর কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ বিশেষ অনুরোধ করে গেলেন—আমার যাওয়া চাই-ই। কি করি, ভদ্রতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। খানিকটা দেখে না হয় উঠে এলেই হবে। নিতান্ত না যাওয়াটা ভালো দেখাবে নাহয়তো—বিশেষ দেশে যখন তত বেশি যাতায়াত নেই।

সন্ধ্যার সময় যাত্রা বসল। যাত্রা জিনিসটা দেখিনি অনেককাল—দেখে বুঝলুম সেকালের যাত্রা আর নেই। জুড়ির গান, মেডেলধারী বেহালাদারদের দীর্ঘ কসরৎ—এসব অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সলমা-চুমকীর কাজ করা সাজ-পোশাকও আর নেই—কলকাতার থিয়েটারের হুবহু অনুকরণ যেমন সাজ-পোশাকে, তেমনি তরুণ অভিনেতাদের অভিনয়ের চঙে। এমন কি কয়েকজন অভিনেতার বলবার ধরন, মুখভঙ্গি ও হাত-পা নাড়ার কায়দা কলকাতার স্টেজের কোন কোন নামজাদা বিশিষ্ট অভিনেতার মতো। দেখলুম, আসরের শ্রোতার দলের মধ্যে যারা তরুণ বয়স্ক তাদের কাছে এরা পেলে ঘন ঘন হাততালি। কেউ কেউ বললে—ওঃ, কি চমৎকার নকলই করেছে কলকাতার স্টেজের অমুককে— বাস্তবিক দেখবার জিনিস বটে!

এমন সময়ে আসরে ঢুকলো একজন মোটা কালো ও বেঁটে লোক। কিসের পাঠে তা আমার মনে নেই। লোকটির বয়স ষাটের উপর হবে, তবে স্বাস্থ্যটা ভালো। কেউ তার বেলা একটা হাততালি দিলে না, যদিও সে দর্শকদের খুশি করার জন্যে অনেকরকম মুখভঙ্গি করলে, অনেক হাত-পা নাড়ালে। আমার সঙ্গে একদল স্কুলের ছেলেবসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল—এ বুড়োটাকে আবার কোথা থেকে জুটিয়েছে? দেখতে যেন একটা পিপে। অ্যাক্টিং করছে দেখ না, ঠিক যেন সঙ!

পাশের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—ও এককালে খুব নামজাদা অ্যাক্টর ছিল হে, তখন তোমরা জন্মাওনি। ওর নাম যদু হাজারা।

আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইলুম, তারপর একবার বৃদ্ধ অভিনেতাটির দিকে চাইলুম। বাল্য দিনের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। সেই কনকনেশীতের রাত্রি, সেই শহুরে ডেঁপো-ছেলেদের সঙ্গ, সেই তারা আমাকে ফেলে কোথায় পালাল—তারপর বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক অপরিচিত গঞ্জের বারোয়ারী আসরে ময়রার দোকানে খাবার খেয়ে আমার সেই একা বিদেশে দু'দিন কাটানো। সে রাত্রে যার অভিনয় দেখে আমার বালক মন মুগ্ধ বিস্মিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—সেই যদু হাজারা এই?

এক সময়ে তার যে ধরনের মুখভঙ্গি দেখে ও কথাবার্তার উচ্চারণ শুনে দর্শকেরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠত, আজও যদু হাজার সেই সব ছবছ করে যাচ্ছে আমারচোখের সামনে—অথচ দর্শকেরা খুশি নয় কেন? খুশি তো দূরের কথা, তাদের মধ্যেঅনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে কেন, বসে বসে এই কথাটাই ভাবলুম।

মন যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অপর লোকের কথা কি, আমারই তো যদুহাজার হাব-ভাব হাস্যকর ঠেকছে! কেন এমন হয়?

বাল্য দিনের সেই যাত্রার আসরে এঁকে আমি দেখেছিলুম, এঁর সেই অভিনয় এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির সঙ্গে রাজার কনিষ্ঠা পত্নীভ্রষ্টা, রাজাএকদিন দুজনকে নির্জনে প্রেমালোপে নিমগ্ন দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কি ভেবে বললেন—‘মধুছন্দা, আমি প্রৌঢ়, তুমি তরুণী, এই বয়সে তোমায় বিবাহ করেভুল করেছি। তোমায় আমি এখনও ভালোবাসি, প্রাণে মারবো না—তোমরা দুজনে আমার চোখের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাত ধরাধরি করে চলে যাও। কিন্তু আমার রাজ্যের বাইরে। আর কখনো তোমাদের মুখ না দেখি’ ওরা ধরা পড়ে দুজনেভয়ে ও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। রাজার সামনে এ কাজ কেমন করে করবে? হাত ধরাধরি করে কেমন করে যাবে? রাজা তলোয়ার খুলে বললেন—‘যাও, নইলেদুজনকেই কেটে ফেলব—ঠিক ওই ভাবেই যাও’।

শেষে তারা তাই করতে বাধ্য হল। রাজা স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে ছিলেন—তারা যখন কিছুদূর চলে গিয়েছে, তখন তিনি হঠাৎ উদ্ভ্রান্তের মতো মুক্ত তলোয়ারহাতে ‘হা-হা-হা’ রবে একটা চিৎকার করে তাদের দিকে ছুটে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গেতারাও আসরের বাইরে চলে গেল। মনে আছে রাজার সেই চমৎকার ভঙ্গিতে, তারহতাশ ‘হা-হা’ রবের মধ্যে এমন একটা ট্রাজিক সুর ছিল, আসরসুদূর দর্শককে তাবিচলিত করেছিল। আমি তখন যদিও নিতান্ত বালক, কিন্তু আমার মনে সেই দৃশ্যটিএমন গভীর দাগ দিয়েছিল যে, এই এত বয়সেও তা ভুলিনি।

পরের দিন যদু হাজার সঙ্গে দেখা হল। ওদের যেখানে বাসা দিয়েছে, তার সামনে একটা টুলের উপর বসে সে তামাক টানছে। আমি বললুম—কাল আপনার পার্ট বড় চমৎকার হয়েছে।

বৃদ্ধ আগ্রহের সুরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভালো লেগেছে?

বললুম—চমৎকার! এমন অনেক দিন দেখিনি!

কথাটার মধ্যে সত্যের অপলাপ ছিল। বৃদ্ধ খুব খুশি হল, মনে হল প্রশংসাজিনিসটা বেচারীর ভাগ্যে অনেকদিন জোটেনি। আসরে কাল যখন তরুণ অভিনেতাদেরবেলায় ঘন ঘন হাততালি পড়েছে, যদু হাজার ভাগ্যে সে জায়গায় বিদ্রূপ ছাড়া আরকিছুই জোটেনি।

বৃদ্ধ বললে—আপনি বোঝেন তাই আপনার ভালো লেগেছে। আর মশায় সেদিনআছে? এখনকার সব হয়েছে আর্ট-আর্ট, সে যে কি মাথামুণ্ড তা বুঝিনে। বৌ-মাস্টারেরদলে ভৃগু সরকার ছিল। রাবণের পার্টে অমন অ্যাক্টো আর কেউ কখনও করবে না। আমি সেই ভৃগু সরকারের সাগরেদ—বুঝলেন? আমায় হাতে ধরে শিখিয়েছেন তিনি। মরবার সময় আমার হাত ধরে বলে গেলেন—যদু, তোমায় যা দিয়ে গেলাম, তোমারজীবনে আর ভাবনা থাকবে না!

আমি বললুম—এ বয়সে আপনি আর চাকুরি কেন করেন?

—না করে কি করি বলুন? বড় ছেলেটি উপযুক্ত হয়েছিল, আজ বছর দুই হলকলেরা হয়ে মারা গেল। তার সংসার আমারই ওপর, নাতনীটির বিয়ে দিতে হবে আর কিছুদিন পরেই। পয়সা আগে যা রোজগার করেছি হাতে রাখতে পারিনি। এখন আর তেমন মাইনেও পাইনে। দেড়শো টাকা পর্যন্ত মাইনে পেয়েছি এক সময়—আমারজন্যে অধিকারী আলাদা দুধ বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, যখন ভূষণ দাসের দলেথাকতাম। এখন পাই পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। আর সতীশ বলে ওই-যে-ছোকরা কাল রামের পার্ট করলে— সে পায় আশি টাকা। ওরা

নাকি আর্ট জানে। আপনিই বলুন তো, কাল ওর পাঁচ ভালো লাগল আপনার, না আমার পাঁচ ভালো লাগল? এখনকার আমলে ওদেরই খাতির বেশি অধিকারীর কাছে। আমাদের চাকরি বজায় রাখাই কঠিন হয়েছে।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, যদু হাজার এতদিন বেঁচে থাকাটাই উচিত হয়নি। চল্লিশবছর আগে তরুণ যদু হাজারকে বৌ-মাস্টারের দলের ভৃগু সরকার যে ভাবে হাত-পা নাড়বার ভঙ্গি ও উচ্চারণের পদ্ধতি শিখিয়েছিল, বৃদ্ধ যদু হাজার আজও যদি তা আসরে দেখাতে যায়, তবে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য হবে না—একথা তাকে বলি কেমন করে? কালের পরিবর্তন তো হয়েছেই, তাছাড়া তরুণ বয়সে যা মানিয়েছে এ বয়সে তা কি আর সাজে?

এই ঘটনার বছর পাঁচ-ছয় পরে নেবুতলার গলি দিয়ে যাচ্ছি, একটা বেনেতি মশলার দোকানে দেখি যদু হাজার বসে আছে। দেখেই বুঝলুম দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে সে ঠেকেছে। পরনে অর্ধমলিন থান, পিঠের দিকটা ছেঁড়া এক ময়লা জামা গায়ে। আমায় দেখে সে চিনতে পারলে না। আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বললুম—আপনিচিনতে পারুন আর না-ই পারুন, আপনাকে না চেনে কে! আঙুন কি ছাই চেপে ঢেকে রাখা যায়? তা এখন বুঝি কলকাতায় আছেন?

বৃদ্ধের চোখে জল এল প্রশংসা শুনে। বললে, আর বাবু মশায়, আমাদের দিনফুরিয়েছে। এই দেখুন, আজ তিনটি বছর চাকুরি নেই। কোন দলে নিতে চায় না। বলে, আপনার বয়স হয়েছে হাজার মশাই, এ বয়সে আর আপনার চাকরি করা পোষাবে না, আসল কথা আমাদের আর চায় না। ভালো জিনিসের দিন আর নেই, বাবু মশায়। এখনকার কালে সব হয়েছে মেকি। মেকির আদর এখন খাঁটি জিনিসের চেয়ে বেশি। আমার গুরু ছিলেন বৌ-মাস্টারের দলের ভৃগু সরকার, আজকালকার কোন্ ব্যাটা অ্যাঙ্কার ভৃগু সরকারের পায়ের ধুলোর যুগি আছে? 'রাই উন্মাদিনী' পালায় আয়ান ঘোষের পাঁচটে যে একবার ভৃগু সরকারকে দেখেচে—

আরও বার কয়েক প্রশংসা করে এই ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নটকে শান্ত করলুম। জিজ্ঞাসা করে ক্রমশ জানলুম এই মশলার দোকানই বৃদ্ধের বর্তমান আশ্রয়স্থল। কাছেই গলির মধ্যে কোন ঠাকুরবাড়িতে এক বেলা খেতে দেয়, রাত্রে এই দোকানটাতে শুয়ে থাকে। দোকানের মালিক বোধ হয় ওর জানাশোনা।

কার্যোপলক্ষ্যে গলিটা দিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করি, আর ফিরবার সময়ে যদুহাজারের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করি। একদিন বৃদ্ধ বললে—বাবু মশাই, একটা কথা বলব? একদিন একটু মাংস খাওয়াবেন? কতকাল খাইনি!

একটা ভালো রেস্টোরাঁতে তাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালুম। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখেমনে হল, বৃদ্ধ কতদিন ভালো জিনিস খেতে পায়নি। তারপর দুজনে একটা পার্কে গিয়ে বসলুম। রাত তখন ন'টা বেজেগিয়েছে। শীতকাল, অনেকে পার্ক থেকে চলে গিয়েছে। একটা বেঞ্চে বসে বৃদ্ধ নিজের সম্বন্ধে কত কথাই বললে। কোন্ জমিদার কবে তাকে আদর করে ডেকে নিজের হাতে সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার অভিনয় দেখে কবে কোন্ মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল, হাতিবাঁধার রাজা নিজের গায়ের শালখুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলতে বলতে মাঝে মাঝে যেন ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে। পঁচিশ বৎসর আগেরকোন্ তরুণী প্রেমিকার হাসিমাখা চাহনি ওর আবেশ-মধুর যৌবনদিনগুলির উপর স্পর্শরেখে গিয়েচে—কে জানে, সেই সব দিন, সেই সব বিস্মৃতপ্রায় মুখ ও মনে আনবারচেষ্টা করছিল কিনা। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—শিখিধ্বজ আর মধুছন্দার সেই অভিনয় আমার বড় ভালো লাগে, সেই যখন রাজা বললেন, 'তোমরাপ্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাত ধরাধরি করে চলে যাও'—সেই জায়গাটা এখনও ভুলিনি।

বৃদ্ধ নট সোজা হয়ে বসল। তার চোখে যৌবন-কালের সেই হারানো দীপ্তি যেন ফিরে এল। বললে—ওঃ, সে কত কালের কথা যে! ও পালা গেয়েছি প্রসন্ন নিয়োগীর দলে থাকতে। দেখবেন—করে দেখাব?

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম—মনে আছে আপনার? দেখান না?

ভাগ্যে পার্কে তখন বিশেষ কেউ ছিল না। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল—আমি হলুম মধুছন্দা, ও নিজের পাট বলে যেতে লাগল—দেখলুম কিছুই ভোলেনি। শেষে আমার দিকেফিরে জলদগম্ভীর সুরে বললে—যাও মধুছন্দা, তোমরা দুজনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতোহাত ধরাধরি করে চলে যাও। তারপর আমি কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধ তার সেই পুরানো ট্র্যাজিক সুরে ‘হা-হা-হা-হা’ করে আমার দিকে উদ্ভ্রস্তের মতো ছুটে এল। সত্যই কি অপূর্ব সে সুর! কি অপূর্ব ভঙ্গি! ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নট তার জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি ওর মধ্যে ঢেলে দিলে। যেন সত্যই ও ভগ্নহৃদয় প্রৌঢ় রাজা শিখিধ্বজ, অবিশ্বাসিনী মধুছন্দা ওকে উপেক্ষা করে তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করেচলে গেল! অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে বৃদ্ধ যদু হাজরা ত্রিশ বছর আগেকার তরুণ নটযদু হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেল।

এই যদু হাজরার শেষ অভিনয়। এর মাসখানেক পরে একদিন নেবুতলায় সেইমশলার দোকানটাতে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলুম সে মারা গিয়েছে।